

উচ্চশিক্ষা

কারিগরি শিক্ষার নতুন ব্র্যান্ডিং এখন সময়ের দাবি

লেখা: মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক, অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আপডেট: ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৫৭



বাংলাদেশের প্রায় কোটিখানেক রেমিট্যান্সযোদ্ধা বিদেশে অবস্থান করছেন। ব্রাজিল পাঠায় হাতে গোনা কয়েক হাজার ফুটবলার। মাথাপিছু আয়ে কে এগিয়ে—এই প্রশ্নের উত্তর আলাদা করে বলার দরকার হয় না।

ব্রাজিলের বিদেশি লিগে খেলা ফুটবলারের সংখ্যা হিসাবভেদে ১ হাজার ২০০ থেকে ৩ হাজারের মধ্যে। ব্লুমবার্গ বলছে, ট্রান্সফার ফি, বেতন আর ইমেজ রাইটস মিলিয়ে এই খাতের মূল্য প্রায় ৫০০ কোটি ডলার। আর আমরা? প্রতিবছর ১০ লাখের বেশি মানুষ বিদেশে পাঠাই, মোট প্রবাসী প্রায় এক কোটি আর ২০২৫ সালে রেমিট্যান্স এসেছে ৩ হাজার ২৮০ কোটি ডলার।

একটু হিসাব করে দেখলেই বোঝা যায়, একজন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার গড়ে একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক আয় তৈরি করে।

এটা প্রতিভার সমস্যা নয়। এটা প্রোডাক্টের সমস্যা।

২০২৫ সালের হিসাব বলছে, বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশিদের প্রায় ৪৩ শতাংশ ‘স্বল্প-দক্ষ’, আর ৩৪ শতাংশ ‘আধা-দক্ষ’। অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষই নিচের দুই স্তরে পড়েন। এর প্রভাব পড়ছে রেমিট্যান্সেও—আমাদের একজন প্রবাসী যেখানে গড়ে মাসে ২০৩ ডলার পাঠায়, একজন ফিলিপিনো পাঠায় প্রায় ৫৬৪ ডলার।

একজন ফুটবলার দেশ ছাড়ার আগে বছরের পর বছর ট্রেনিং পান, পরীক্ষা দেন, প্রমাণ করেন তিনি প্রস্তুত। আর আমাদের শ্রমিক? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি ছাড়াই বিদেশে যান।

ভালো খবর হচ্ছে, সরকার এখন অন্তত এই বাস্তবতা স্বীকার করছে। আর সেটা ক্ষমতায় আসার পর না, তারও আগে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছিলেন, ‘মাধ্যমিক স্তর থেকেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা আছে। সঙ্গে ছিল জনশক্তিকে “দক্ষ সম্পদে” রূপান্তরের কথা, এমনকি তৃতীয় ভাষা শেখানোর পরিকল্পনাও।’

এই কথাগুলো পরে আসেনি, ইশতেহারেই ছিল।

আর কিছু অগ্রগতিও দেখা যাচ্ছে। সরকারের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই কারিগরি শিক্ষাকে ‘সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার’ বলা হয়েছে। ১২ হাজার কলেজশিক্ষককে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ চলছে। প্রতিটি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল, প্রতিটি জেলায় পলিটেকনিক—এই পরিকল্পনাও এসেছে সামনে।

কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, কোনো সরকার যদি ভোটের আগেই একটা বিষয়কে গুরুত্ব দেয়, তাহলে বোঝা যায়, এটা হঠাৎ বলা কথা নয়, সমস্যাটা তারা আগেই বুঝেছে। তাই এখন প্রশ্নটা আরও সরাসরি—বাস্তবে এটা কীভাবে কাজ করবে?

কিন্তু আসল প্রশ্নটা এখনো রয়ে গেছে। ‘বাধ্যতামূলক’ আর ‘দক্ষতাভিত্তিক’ শিক্ষা—শুনতে ভালো। কিন্তু বাস্তবে সেটা দাঁড়াবে কীভাবে?

সোজা করে বললে, তিনটা জিনিস দরকার।

প্রথমত, এমন একটা সনদ—যেটা নিয়োগদাতারা সত্যি বিশ্বাস করে, দেশে-বিদেশে দুই জায়গাতেই।

দ্বিতীয়ত, এমন সিলেবাস—যেটা চাকরির সঙ্গে মেলে, কাগজে-কলমে বানানো নয়।

তৃতীয়ত, একটা নাম—যেটা লিখতে গর্ব হয়।

শুরুটা নাম থেকেই করা যাক।

‘কারিগরি শিক্ষা’—শব্দ দুটি আমাদের সমাজে অনেক দিন ধরে একটা নেতিবাচক ধারণা বহন করে। অনেক অভিভাবকের কাছে এটা সেই রাস্তা, যেখানে ‘ভালো ছাত্ররা যায় না’। বাস্তবতা যা-ই হোক, ধারণাটা কিন্তু বদলায়নি।

কিন্তু একই দক্ষতা একজন বাংলাদেশিকে জাপানে কেয়ারগিভারের চাকরি এনে দেয়, আরেকজনকে সৌদিতে ওয়েল্ডার হিসেবে কাজ দেয়।

সমস্যা দক্ষতায় নয়, সমস্যা আমরা কীভাবে সেটাকে দেখি।

দক্ষিণ কোরিয়া এ সমস্যা বুঝেছিল। তারা ‘ভোকেশনাল স্কুল’ শব্দটা বাদ দিয়ে নাম দিয়েছে ‘মাইস্টার হাইস্কুল’, যেখানে দক্ষতা মানে বিকল্প নয়, বরং উৎকর্ষ।

বাংলাদেশ প্রতিবছর বিদেশে পাঠায় প্রায় এক কোটি শ্রমিক। ব্রাজিল পাঠায় হাতে গোনা কয়েক হাজার ফুটবলার। মাথাপিছু আয়ে কে এগিয়ে—এই প্রশ্নের উত্তর আলাদা করে বলার দরকার হয় না।

বাংলাদেশেও নামটা নতুন করে ভাবা দরকার—স্কিলস অ্যান্ড প্রফেশনাল এডুকেশন বা ইন্ডাস্ট্রি স্কিল এডুকেশন—যে নাম শুনলে একজন শিক্ষার্থী লজ্জা না পেয়ে গর্ব বোধ করে।

তবে শুধু নাম বদলালেই হবে না। কারণ, সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত নেন অভিভাবকেরা। তাই তাঁদের সামনে বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরতে হবে—কে কত দ্রুত চাকরি পায়, কত বেতন দিয়ে শুরু করে। রংপুরের একজন মা যদি জানেন যে একটি ভালো পলিটেকনিকের ডিপ্লোমাধারী দুই বছরের মধ্যে একজন সাধারণ গ্র্যাজুয়েটের চেয়ে বেশি আয় করতে পারে, তাহলে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতেই পারে।

এবার আসি সনদের কথায়। ২০২৫ সালের হিসাব বলছে, বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশিদের প্রায় ৪৩ শতাংশ ‘স্বল্প-দক্ষ’, আর ৩৪ শতাংশ ‘আধা-দক্ষ’। অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষই নিচের দুই স্তরে পড়ে। এর প্রভাব পড়ছে রেমিট্যান্সেও—আমাদের একজন প্রবাসী যেখানে গড়ে মাসে ২০৩ ডলার পাঠায়, একজন ফিলিপিনো পাঠায় প্রায় ৫৬৪ ডলার।

একই বাজার, কিন্তু প্রস্তুতি আলাদা। সৌদি আরব ইতিমধ্যেই নিজেদের মানদণ্ড বসিয়ে দিয়েছে। স্কিল ভেরিফিকেশন ছাড়া ভিসা নেই। এটা বাধা নয়, বরং সুযোগ। কারণ, এই মানদণ্ড ধরেই আমরা আমাদের সিস্টেম সাজাতে পারি।

যদি আমাদের সিলেবাস সরাসরি সেই পরীক্ষাগুলোর সঙ্গে মেলে, তাহলেই একজন বাংলাদেশির সনদ বিদেশে গিয়ে আবার প্রমাণ করতে হবে না। চাহিদার অভাব নেই। জাপান শ্রমিক খুঁজছে, জার্মানিতে হাজার হাজার প্রশিক্ষণ পদ খালি। সমস্যা দরজায় নয়, সমস্যা সেই দরজা পর্যন্ত পৌঁছানোর সিঁড়িতে।

সমাধানও অজানা নয়। দক্ষিণ কোরিয়া হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান বানায়নি—মাত্র কয়েকটা ভালো প্রতিষ্ঠান বানিয়ে সেগুলোকে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

আমাদেরও হয়তো কমসংখ্যক, কিন্তু শক্ত প্রতিষ্ঠান দরকার—যেগুলো সত্যিকারের ফলাফল দেয়।

সরকার সমস্যাটা ধরেছে—এটাই বড় কথা। এখন দেখার বিষয়, ‘বাধ্যতামূলক’ আর ‘দক্ষতাভিত্তিক’ শব্দগুলো কাগজে থাকে, নাকি বাস্তবে গিয়ে দাঁড়ায়—একটা বিশ্বাসযোগ্য সনদ, একটা সম্মানজনক পরিচয় আর অভিভাবকের আস্থায়।

সেখানেই ঠিক হবে—এই সুযোগ আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারলাম।

*লেখক: মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক, অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

